বোম্বাইএর দুই লক্ষ সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট

ঐক্যবিরোধী প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মিলিত অভিযান

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | রবিবার, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৫০, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার শোষণ কায়েম রাখার অস্ত্র ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সম্মিলিত আক্রমণকে প্রতিরোধ করুন

কাপড়ের রাজাদের লাভ দমন করে শ্রমিক ও কর্মীদের মজুরী ও বোনাস বাড়াতে হবে—কাপড়ের দাম কমিয়ে জনতাকে উপযুক্ত কাপড় ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে

বর্ত্তমান কাঠামোতে শালিসী প্রভৃতি যাই করুক সরকার, তার একমাত্র উদ্দেশ্য যে পুঁজিপতিদের কৌশলে সমর্থন করা এবং শোষিত শ্রমজীবি মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিভেদে ছিন্নভিন্ন করে তাদের ওপর আক্রমণ চালান—সে বিষয় দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসী আমলে যতগুলি শালিসী বসেছে তার প্রতিটির রায়ই শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে অগ্রাহ্য করে, তাদের মজুরী ও অন্যান্য আয় কমিয়ে ধনিকের লাভের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করেছে। বোম্বাইএর কাপড়ের কলের ব্যাপারেও তাই। যে কাপড়ের রাজারা বছরে কোটী কোটী টাকা মুনাফা করেছে—২০ কোটী টাকার মত লুটেছে যেখানে শুধু সাতটি মিল এক বছরে, চোরাকারবারে যারা ৬ মাসের মধ্যে নিয়তম পক্ষে ১০০ কোটী টাকা কামিয়েছে জনসাধারণের গলায় ছুরী মেরে, সেখানে শ্রমিকের মজুরী বাড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই—একথা উন্মাদ কিংবা দালালরাই বলতে পারে।

ট্রাইব্যুনাল দীর্ঘদিন টালবাহানের পর রায় দিয়েছে—বোম্বাইএর কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বোনাসের পরিমাণ হবে প্রত্যেকের মাইনের দু গুণ। এ ব্যবস্থা যে নিতান্ত অকিঞ্চিতকর তা যে কোন নিরপেক্ষ লোক স্বীকার করবে। তবুও পুঁজিপতি শ্রেণী ট্রাইব্যুনালের এই যৎসামান্য সাহায্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তারা শালিসীর রায়কে অগ্রাহ্য করে বলে এই পরিমান বোনাস তারা দেবে না।

এ ক্ষেত্রে সরকারের উচিত ছিল যারা রায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছে তাদের সাজা দেওয়া। তা না করে সরকার পক্ষ পরোক্ষ ভাবে তাদের সাহায্যই করছে। শ্রমিক শ্রেণী তিনমাসের বোনাস চেয়েছিল, তা তারা পায়নি, উপরন্তু শালিসীর রায়ে তারা যা পেয়েছে তাও কলওয়ালারা দিতে নারাজ। সুতরাং তাদের ধর্মঘট করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না। ২লাখ সুতাকল মজুর ১৪ই আগষ্ট থেকে ধর্ম্মঘটে নামল। যেই শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটে নামল সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল সরকারী সন্ত্রাসন। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের ধরে নিয়ে যাওয়া, আটকে রাখা, কারারুদ্ধ করা, মারধোর করা—গুলি-করে মারা এসব ঘটনা নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। মোরারজী দেশাইএর পুলিশ বাহিনী ও সৈন্যবাহিনী বোম্বাই এর কল-ওয়ালাদের হয়ে শ্রমিক কর্ম্মচারী মারার কাজে নেমে পড়ল সরকারী আদেশে।

সরকার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর এই মিলিত আক্রমণকে শ্রমিক শ্রেণী ঐক্য-বদ্ধতার জোরে ঠেকাতে বদ্ধ পরিকর হল, সমস্ত শ্রমিক এক সাথে থাকবে পুঁজিবাদী কলওয়ালাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালাও, মালিক ও কংগ্রেস চালিত দালাল প্রতিষ্ঠান 'রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সংঘ' খতম হক—এই সব ধ্বনি চারিদিকে কাঁপিয়ে তুলল। গোটা বোম্বাইয়ের তিনটি কোন রকমে চালু সুতা কল ছাড়া সব মিল বন্ধ হয়ে গেল। শ্রমিকের এই সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতাকে যেখানে আরও সংহত করার দরকার সেখানে সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতারা ঐক্যবদ্ধতার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন, বললেন সোস্যালিষ্ট মিল মজদুর সভার অন্তর্গত কোন ইউনিয়ন অন্য কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডিমনষ্ট্রেশন, সভা প্রভৃতি যেন না করে। উদ্দেশ্য হল—পরোক্ষে ধনিক শ্রেণীকে সাহায্য করা, শ্রমিকের ঐক্য-বদ্ধতায় ফাটল ধরান। এই বিশ্বাস ঘাতকতার আহ্বান সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী এখনও পর্য্যন্ত বিভেদে ছিন্নভিন্ন ও বিভ্রান্ত হয় নি। তবে এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে ধর্ম্মঘট বানচাল হয়ে যাবে, বড়লোকের দল জিতে যাবে. আর অত্যাচার দশগুণ বেড়ে যাবে—এসব কথা শ্রমিক ভাইদের বুঝে নিতে হবে।

দেশের লোক যেখানে কাপড় পরতে পায়না, উৎপাদন হ্রাসের জন্য যেখানে শ্রমিককেই এর জন্য একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করে তাদের জেল জরিমানা পর্য্যন্ত করা হয় সেখানে কলওয়ালাদের মুনাফা বাড়াবার এই ষড়যন্ত্র ও সেই কাজে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য জনসাধারণ ঘৃণার চোখে দেখে। পূজা আসছে ; উৎপাদিত কাপড় ধর্ম্মঘটের জন্য কমে গিয়েছে সুতরাং দাম আকাশ-স্পর্শী হারে দিতে হবে, এই অজুহাত দেখিয়ে সরকারী সমর্থনে মিল মালিকরা কোটী কোটী টাকা লুঠবার ষড়যন্ত্রকরছে। তাকে বানচাল করায় জন্য দাবী তুলুন—

- প্রত্যেক শ্রমিককে বাঁচার মত মজুরী ও তিনমাসের মজুরীর সমান বোনাস দিতে হবে।
- ধৃত শ্রমিকদের মুক্তি দিতে হবে
- কাপড়ের দাম কমাতে হবে।
- ধনিকের মুনাফা লোটা বন্ধ করতে হবে।

এই দাবীর ভিত্তিতে সারা দেশব্যপী আঞ্চলিক ভিত্তিতে আন্দোলন গাড় তুলে নিজেদের বহু সমস্যার সমাধান করুন।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের উপর পুলিশী জুলুম

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশে

পার্টি কর্মী নির্য্যাতীত ও গ্রেপ্তার

কংগ্রেসী সরকারের জুলুম সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের ওপর রোজ বেড়েই চলেছে। গত ১৪ই আগষ্ট রাত্রে দলের কর্ম্মীরা যখন ১৫ই আগষ্টের ভুয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গণ প্রতিবাদের ব্যবস্থা করছিলেন তখন কলিকাতা পুলিশ, স্পেশাল বিভাগের অফিসারদের সহযোগিতায় দলের এই কাজকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে কলিকাতায় দলের বিভিন্ন কেন্দ্রে খানাতল্লাসী চালায়। পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস, কেন্দ্রীয় কম্যুন, হামারী পথও গণদাবী অফিস, কালচার ক্লাব, খিদিরপুর ইউনিট অফিস প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি দীর্ঘ সময় ধরে খানাতল্লাসী করা হয়। ঐদিন পোষ্টারিং এর সময় কমরেড জনক পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন।

এর পরই বিহার দলের ওপর হামলা চালান হয়। ১৯শে আগষ্ট সিংহভূমের বিখ্যাত কৃষক নেতা ও দলের বিশিষ্ট কর্ম্মী জগন্নাথ সারাণকে বিহার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গত ২৪শে আগষ্ট পশ্চিম বাংলা পুলিশ স্পেশাল বিভাগের কর্ম্মকর্তাদের সহ-যোগিতায় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রে খানাতল্লাসী চালায়। জয়নগর মজিলপুরের বিশিষ্ট কৃষক ও ছাত্রনেতা কমরেড নীরেন্দু ব্যানার্জী, ২৪ পরগণা ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের বিশিষ্ট সংগঠক ইয়াকুব পৈলান এবং মজিলপুরের কৃষক নেতা সুলেমান গাজীর গৃহ খানা-তল্লাসী করা হয়। তাঁদের দীর্ঘসময় ধরে আটক রাখা হয়।

উত্তর প্রদেশের ও. টি. রেলওয়ে কর্ম্মী ইউনিয়ন ও দলের সংগঠনের কাজে কমরেড দুর্গা মুখার্জী ও পুরণদেও সিং গোরক্ষপুর পৌছালে উত্তর প্রদেশের পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত না করেও তাঁদের কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

কংগ্রেসী সরকারের এই ধরণের জবরদস্তি-মূলক সন্ত্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখুন।

ত্রুটী স্বীকার

পোষ্ট অফিসের নিয়ম সংক্রান্ত কিছু গোলযোগের জন্য গণদাবীর তৃতীয় বার্ষিক দ্বিতীয় সংখ্যা গ্রাহকদিগের নিকট পৌছাইতে অযথা বিলম্ব হয় এবং কয়েক ক্ষেত্রে উহা বেয়ারিং হওয়ায় গ্রাহক দিগকে এক আনা করিয়া দিয়া গণদাবী গ্রহণ করিতে হয়। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক লজ্জিত। যাঁহাদের এক আনা করিয়া অতিরিক্ত দিতে হইয়াছে তাঁহাদিগের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁহারা নাম ঠিকানা গণদাবী অফিসে পাঠাইয়া দিলে ; আমরা তাঁহাদের নামে এক আনা করিয়া জমা করিয়া লইব।

রথীন সেন
ম্যানেজার, গণদাবী

বিপদ আসছে বাঁচতে হলে তাকে রুখুন

দীর্ঘদিন অর্দ্ধাশনে কাটাবার পর এল অনশনের পালা, জনতার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, তারা দাবী জানাল বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে—খাদ্য চাই। কংগ্রেসী নেতারা গুলি, গ্যাস আর লাঠির সাহায্যে জবাব দিলেন—খাদ্য পাবে না। অর্দ্ধমৃত মানুষের দল বাঁচবার আশায় গাছের পাতা, গুল্মের মূল তুলে খেতে আরম্ভ করল, দেখা দিল মহামারী, এক গ্রাসে নিয়ে গেল হাজার হাজার গ্রামবাসীর জীবন। এই হল বাস্তব ঘটনা মাদ্রাজে। মাদ্রাজ পরিষদ অভিমুখে দুর্গত অঞ্চল হতে যে অসংখ্য চিঠি আসছে তার প্রতিটি ছত্র দুরবস্থার কথায় ভরা। আর শুধু মাদ্রাজ কেন, ভারতের প্রতিটি অন্ত-প্রত্যন্তেই এই অবস্থা দেখা দিচ্ছে। কোথাও বিপদ এসে হানা দিয়েছে, কোথাও বা দেবে দেবে করছে। তবুও কংগ্রেসী নেতাদের মতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়নি। মাদ্রাজী মানুষ বলছে— শিশুকে খেতে দিতে পারিনে বলে তো তাকে গলা টিপে খুন করতে পারিনে। তাই তাকে বিক্রী করে দিচ্ছি।" কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী মুন্সিজী এর জবাব দিলেন—"স্রেফ মিথ্যে কথা।" হাজার হাজার ভুখা মানুষের মিছিল বাংলার প্রান্তে খাবার চাইতে গিয়ে গুলি খেয়ে ফিরে এল। তারা দাবী করল—"৬০৲ টাকা চালের মণ, খেতে পাচ্ছি না; খাবার দাও।" বাংলার জন সংভরণ মন্ত্রী ঘোষণা করলেন—"মিথ্যে কথা, ৬০৲ টাকা চালের মণ নয়; ৫৫৲ টাকা প্রতি মণ।" দারিদ্র ঐখানেই শেষ। বিহারে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে চলেছে না-খেতে-পাওয়া রোগে ভুগে; মন্ত্রীরা বলছেন —"খাদ্যপরিস্থিতি আশঙ্কাজনক নয়।" এই হল সরকারী নীতি। জনজীবনের প্রতি দরদের কণামাত্রও টের পাওয়া যাবে না এদের কোন কাজে।

শুধু তাই নয়। একদিকে জনতা খেতে না পেয়ে মারা পড়ছে, অন্যদিকে মাদ্রাজের বন্দরে হাজার হাজার টন খাদ্য-শস্য জমে পচছে। একদিকে গ্রামের বুভুক্ষু মানুষ এক মুঠো চালের অভাবে গাছের শিকড় খেয়ে কলেরায় প্রাণ হারাচ্ছে অন্যদিকে খড়চাপা দিয়ে হাজার হাজার বস্তা চাল পাচার হচ্ছে কালোবাজারে, সরকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়। এই হল আজকের অবস্থা, নেতাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের হালচাল। তুলনা করুন এর সঙ্গে ১৩৫০ সাল। ৫০ লাখ বাঙালী খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারাল পশুর মত, আর সামরিক কর্তৃপক্ষ কয়েক হাজার টাকা মাইনেতে রাসায়নিক নিযুক্ত করল পচা পাঁউরুটী থেকে সার তৈরী করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করতে। ইস্পাহানি, দত্ত প্রভৃতি চাঁইদের গুদামে লাখ লাখ মণ চাল জমে রইল আর ডাষ্টবিন ঘেঁটে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে খাবার খুঁজতে হল গরীব বাঙালী মানুষকে। প্রাচুর্য্য ও তৃপ্তির উদ্গার তোলে মুষ্টিমেয় শোষকের দল আর যারা বুকের খুন ঢেলে ফসল বুনল সেই শ্রমজীবি বাঙালী এক ফোঁটা ফ্যানের আশায় দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াল। সে দিনের সঙ্গে আজকের তফাৎটা তাহলে কোথায়? কমনওয়েলথ মার্কা স্বাধীনতা আর ইংরেজ শাসনের যুগে তফাৎটা গণ জীবনে কোথায় পড়ল?

তখনও লাখে লাখে সাধারণ মানুষ মরেছে না খেতে পেয়ে আজও মরছে এবং ভবিষ্যতেও মরবে যতদিন কংগ্রেসী স্বাধীন ভারতবর্ষ টিকে থাকবে। ১৫ই আগষ্টে স্বাধীনতা তো সাধারণ ভারতবাসী পায়নি, পেয়েছে ভারতবর্ষের দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণী। তাই তাদের বিপদ আসেনি বরং তাদের লাভের মাত্রা বাড়ছে। ভারতীয় রাষ্ট্র যদি জনরাষ্ট্র হত তাহলে ভারতীয় জনতাকে না খেয়ে মরতে হত না তার সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষের মত বাঁচার সুযোগ আসত। যেহেতু ভারতীয় রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাই তার লক্ষ্য পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা রক্ষা করা, জনসাধারণ খেতে পেল কি পেল না তা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ভারতীয় রাষ্ট্র খাদ্য সমস্যার সমাধান করে দেবে, জনতার উচিত সরকারকে সর্ব্বরকমে সাহায্য করা, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই রকম ঘটনা ঘটে থাকে প্রভৃতি কথা বলে নেতারা যে ধাপ্পা দিচ্ছে তাতে বিশ্বাস করলে প্রাণ বাঁচবে না; পঞ্চাশের মন্বন্তরে যেমন কুকুর বেড়ালের মত পথে ঘাটে মরতে হয়েছিল তেমনি করেই মরতে হবে। মরতেই যদি হয়, অত্যাচারীর গলা টিপে তাকে খতম করে মরব, ভালভাবে মানুষের মত বাঁচার চেষ্টা করে মরব, না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে ক্লীবের মত মরব না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে জনতাকেই এগিয়ে আসতে হবে, নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে।

এখানে একটু তালি, ওখানে একটু পলেস্তারা এই ধরণের তাপ্পি লাগিয়ে দুর্ভিক্ষকে বন্ধ করা যাবে না কিংবা দান খয়রাতি করে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। রোগ দূর করতে হলে তার মূল ধরে উপড়ে ফেলতে হবে, শুধু তার বাহ্যিক লক্ষণ গুলিতে প্রলেপ লাগালে চলবে না। অবশ্য আশু কর্ত্তব্য হিসেবে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল গুলিতে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা প্রভৃতি কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু এই কাজগুলি করে দুর্ভিক্ষকে চিরতরে থামান যাবে না, দুদিন বাদে আবার তা দেখা দেবে! সুতরাং দুর্ভিক্ষের আসল কারণগুলি দূর করতে হবে।

সুতরাং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্যসূচী দুটী অংশে ভাগ করা যেতে পারে। এর এক দিকে থাকবে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে রিলিফ দেওয়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের লক্ষণ-গুলিকে এখনই দূর করা; অন্যদিকে থাকবে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ গুলিকে চিরকালের জন্য উৎপাটিত করা।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধু ও হুল

পণ্ডিত নেহেরু সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় পাণ্ডিত্যের অদ্ভুত পরিচয় দিয়ে বলেছেন—"খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর কিন্তু দুর্ভিক্ষের কথা বলা নিতান্ত মূর্খতা।" সত্যই ত। এখনও গাছে পাতা, মাঠে ঘাস, বনবাদাড়ে স্বতকুমারী জাতীয় গাছের মূল যখন মেলে তখন দুর্ভিক্ষের কথা বলা শুধু নিতান্ত মূর্খতা নয়, দেশে ও বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সম্মান 'সবোতাজ' করার চেষ্টাও বটে। দেশবাসী পণ্ডিতজীর মত এত পণ্ডিত নয়, তাই তারা খেতে না পেলেই চিৎকার জুড়ে দেয়। এই ধরণের অসভ্য চিৎকারে মেজাজী মন্ত্রীদের মৌতাতটা কেটে যাওয়াই স্বাভাবিক। বোঝা উচিত দিন রাত দেশের জন্যে ভেবে ভেবে যাঁদের কাঁচা চুল অকালে পেকে গেল কিংবা ঝরে পড়ল তাঁদের এই রকম ভাবে বিরক্ত করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তার চেয়ে যাদের জন্যে খাবার এত কষ্ট তাদের জব্দ করলেই হয়। নির্দোষ লোকে যাতে অহেতুক না ভোগে সেই জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মূর্খ দেশবাসীকে বলে দিলেন—"বাংলা ও আসামে অসংখ্য উদ্বাস্তুকে খাওয়াতে হয়।" অর্থাৎ যদি ভাল করে খেতে চাও ত, ঐ উদ্বাস্তুর দলকে খেদিয়ে পাকিস্থানে পাঠিয়ে দাও। এক ঢিলে দুই পাখী মারার এমন চমৎকার টিপ যাঁর, তাঁর সৈন্যদের চাঁদমারিতে লক্ষ্য অভ্যাসের শিক্ষা দেবার দায়িত্বটাও নেওয়া উচিত।

* * *

"অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।' শনির নজর পড়লে পোড়া মাছও জলের তলায় পালায় এ উদাহরণ পুরাণে আছে। কলি যুগে ও যে একথা কত খাঁটি তা বলা যায় না। ৬০ লাখ বাস্তু-হারা ভিটেমাটি ছেড়ে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাদের যে, পশ্চিম বঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী, এই না কত ভাগ্যের কথা, তা নয় নিত্য রোজ নানা রকম বায়নাক্কা তারা বাধাচ্ছে তো বাধাচ্ছে। আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই—এ সব তো লেগেই আছে। তার ওপর কি দুর্মুখ রে বাবা! কথায় কথায় কটু কথা শোনায়। এই সব দেখে অন্ততঃ পক্ষে তাদের মুখের কথাটা যাতে মিষ্টি হয় এই ভেবে পশ্চিম বাংলার জন সংভরণ মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মশাই শেয়ালদা ষ্টেশনের উদ্বাস্তুদের জন্যে কয়েক বস্তা গুড় পাঠান। কিন্তু পাঠালে কি হবে বস্তা খুলতে যা বেরুল তার মধ্যে ১০ ভাগ হল শক্ত গুড় আর বাকি ৯০ ভাগ কয়লার গুড়ো। বোধ হয় শনি কিংবা কোন মন্ত্রীর দৃষ্টির ফলেই এটা ঘটল। বাস্তুহারারা এই দেখেই ত ক্ষেপেই আগুন, খাবার জন্যে কয়লার গুড়ো পাঠান হয়েছে—কেন উদ্বাস্তুরা কি ইঞ্জিনের বয়লার যে কাঁচ' কয়লা খাবে? আমাদের উপদেশ, এতে রাগের বদলে খুসী হওয়াই উচিত। মা ঠাকরুণদের ছাই দান করে হাত খোলার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। মন্ত্রীরাও কয়লার গুড়ো দিন, তাহলে ভবিষ্যতে যদি বদ্ধহাত একটু খোলে।

* * *

পণ্ডিতজী পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শকীয় পরিষদে বলেছেন—"আপনারা বক্তৃতা করে সময় নষ্ট করবেন না, সোজাসুজি কার্য্যক্রম আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।" এর পাশেই খবর বেরুল প্রধান মন্ত্রী খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বেতারে ইংরাজী ও হিন্দিতে ভাষণ দেবেন এবং পরদিন সাংবাদিক বৈঠকে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। এই দুটো খবর পড়ে জনৈক সহযোগী বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রশ্ন করেছেন—এটা কেমন হল? অন্যকে যিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে বারণ ক'রে উপদেশ দেন কাজ করতে, তিনি এত সব দীর্ঘ দীর্ঘ কথার জাল কেন বুনছেন? বোঝা গেল সহযোগীর ভীমরতি ধরেছে, চাকরী গেল বলে। তিনি কি ভুলে গিয়েছেন—সত্য যুগ থেকে একটা কথা চলে আসছে—আমি যা বলি তাই কর, যা করি তা কর না। বক্তৃতা, বাণী' বিবৃতি এ সব মন্ত্রীদের prerogative সাধারণ লোকে তাকে privilege হিসাবে চাইলে চলবে কেন? মন্ত্রীরা যা খুশী তাই বলবেন, আমরা দেশবাশীরা তা বিনা প্রতিবাদে শুনব—এই তো হচ্ছে রীতি। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে কি রক্ষে আছে? পথে পথে ঘুরে কিংবা জেল খেটে মরতে হবে। কি দরকার বাপু তার? সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

● কোরিয়ায় মার্কিনদস্যুদের পৈশাচিকতা ● 'গণতন্ত্রী' মার্কিনের ফ্যাসিষ্টফ্রাঙ্কো তোষণ ● বেলজিয়ামে সোস্যালডিমোক্র্যাটদের বিশ্বাসঘাতকতা ● সৌদিআরবে মার্কিনযুদ্ধঘাঁটী

কোরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ যতই সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীরা মরিয়া হয়ে ততই পৈশাচিক অত্যাচার চালাচ্ছে কোরিয়াবাসীদের ওপর। কোরিয়ার জনকয়েক বিশ্বাসঘাতক কুইসলিং ছাড়া সারা দেশের লোক যে এই মুক্তিযুদ্ধের পেছনে, মার্কিন সৈন্য ও তাদের ভাড়াটে দেশীয় পুঁজিপতি ও জমিদার গোষ্ঠীকে যে তারা দেশ থেকে উৎখাত করতে কৃত সঙ্কল্প এ কথা সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্র গুলিও চেপে রাখতে পারছে না। একদিকে দেশের লোকের এই ইস্পাৎ-কঠোর সঙ্কল্প ও দেশের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম অন্যদিকে যুদ্ধবাদীদের কোরিয়াকে চিরকাল তাঁবেদারে বেঁধে রেখে শোষণ করার ষড়যন্ত্র। জনতার সংগ্রামী মনোভাবে নিজেদের অবাধ লুণ্ঠনের সমস্ত চক্রান্ত ভেসে যায় দেখে ইঙ্গ মার্কিন কোটীপতি ও তাদের ভড়োটে সৈন্যদল আজ নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে চলেছে অসামরিক জনসাধারণের ওপর, আকাশ ও সমুদ্র থেকে গোলা চালিয়ে সহরের পর সহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে এবং কোটী কোটী নিরীহ মানুষকে নিচিহ্ন করে দিচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল কোরিয়াবাসীদের মনোবলকে ভাঙার চেষ্টা করা; সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী জনতাকে একেবারে শেষ করা। কিন্তু তা যে হবে না তাও ঠিক।

আকাশ থেকে হাজার হাজার বোমা ফেলে এই সব দানবদের পৈশাচিকতা তৃপ্ত হচ্ছে না। গ্রামের মধ্যে সৈন্য পাঠিয়ে সমস্ত জনতাকে গুলি করে ও আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। জাতিসংঘের দরবারে ধড় গলা করে বলা হয়েছিল অসামরিক অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালান হবে না। সে কথা আজ কোথায়? ইঙ্গ মার্কিন কর্ত্তারা, আজও, যে অঞ্চল মুক্ত হয়নি মুক্তি ফৌজের দ্বারা অর্থাৎ আজ যেখানে সিংম্যানরীর শাসন টিকে আছে সেখানে ও বিভৎস আক্রমণ চালাচ্ছে। **রংউল গ্রামের সাত হাজার গ্রামবাসীদের বিনা কারণে একসঙ্গে জমায়েত করে হত্যা করেছে মার্কিন সামরিক কর্ত্তারা।** আর হত্যার কায়দা ও অসামান্য। রাইফেল তলোয়ার, সঙ্গীন চালিয়ে আর কুলিয়ে উঠছে না বলে **জীবন্ত অবস্থায় তাদের কবর দেওয়া হচ্ছে।** চারশ হাত লম্বা চার হাত চওড়া এবং চার হাত গভীর খাদে গ্রাম থেকে লরী বোঝাই করে ধরে আনা গ্রামবাসীদের হাজারে হাজারে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এ অত্যাচার যে শুধু পুরুষদের ওপর চালান হচ্ছে তা নয়; নারী ও শিশুরা এই ধরণের পাশবিকতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। চিয়াং এর রাজত্বে চৈনিক শিশুদের যেমন আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে সঙ্গীনের খোঁচায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল বহু অঞ্চলে, পাইকারী হারে নারী ধর্ষণের হুকুম দেওয়া হয়েছিল কুওমিনটাঙী সৈন্যবাহিনীকে তেমনি ধারা অত্যাচার চালাচ্ছে কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যবাহিনীরা তাদের কর্ত্তাদের আদেশে।

হিটলারের আমলে বেলসেনে যে পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছিল কোরিয়ায় তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে আরও কঠোর আরও নির্মম ভাবে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন কর্তৃপক্ষের এতে লজ্জা নেই। ফ্যাসিবাদ জনশক্তিকে অগ্রাহ্য করে অস্ত্রবলে জগত জয়ের নেশায় বিভোর। তাই সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির মাথায় লাথি মেরে তারা এই অচিন্তনীয় বর্ব্বর অত্যাচারে মেতে উঠেছে। তবে ইতিহাসের শিক্ষা হল, এ যুগ গণশক্তির জয়ের যুগ, গোলা বারুদ আর আণবিক বোমার জোরে নির্বিচারে লাখে লাখে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেও এরা অগ্রগতিকে রোধ করা যাবে না। কোরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হইবেই হবে।

সোস্যালডিমোক্র্যাটদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে ভরা ইতিহাস আরও একটা বিশ্বাসঘাতকতার কালীতে বেশী করে কলঙ্কিত হল। ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম প্রতিটি দেশে যখনই নামধারী সোস্যালিষ্টরা রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তখনই তাদের সমাজতন্ত্রের বড় বড় প্রতিশ্রুতির আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে, পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাদের ধনতন্ত্রের রক্ষকের ভূমিকা। শুধু এই টুকুই নয় জনতার আন্দোলনকে 'সাবোতাজ' করতে, দরকার পড়লে জনতার রক্তে দেশের মাটী ভিজিয়ে দিতে তারা যে অদ্বিতীয় তার প্রমানও তারা দিয়েছে। জার্মান সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নস্কের হাতে লাখ জার্মান শ্রমিক বালিনের পথে প্রান হারিয়েছে, ফরাসী সোস্যালিষ্ট (?) ব্লুমের দৌলতে ফরাসী শ্রমিকের লড়াই করে জেতা মজুরী কেটে নেওয়া হয়, ইতালীর এককালের সোস্যালিষ্ট নেতা' মুসোলিনী ফ্যাসিবাদের জনকরূপে পরিচিত, ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকারের আমলে স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার মালয়ী দেশপ্রেমিককে বিনাবিচারে হত্যা করা হচ্ছে। বেলজিয়মে স্পাক চক্র যে গণআন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে?

বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়ামকে বিকিয়ে দেয় নাৎসী জার্মানীর পায়ে। তার পর লালফৌজের অতুলনীয় শৌর্য্যে যখন যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেল, বেলজিয়ামের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা যখন সফল হল তখন লিওপোল্ডকে রাজাগিরি ছাড়তে হল। জনসাধারণ বিশ্বাসঘাতক রাজচক্র খতম করতে বদ্ধ পরিকর হল। তখনকার মত বিষয়টাকে ধামাচাপা দিয়ে রেখে সুযোগ বুঝে আবার তাঁকে রাজ তক্তে ফিরিয়া আনল দশদ্রোহীর দল। দেশের প্রগতিবাদী জনতা বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, দিকে দিকে ধর্মঘটের বন্যা নেমে এল, তিনলাখ শ্রমিক মধ্যবিত্ত কেরানীকে দলে টেনে আওয়াজ তুলল ফ্যাসিষ্ট রাজার পতন চাই, প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ধ্বংস হক মানুষের মত বাঁচতে চাই।

প্রতিক্রিয়ার সমর্থনে সৈন্যদল এগিয়ে এল। শ্রমিকরা তার জবাব দিল রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে। লিজ প্রভৃতি সহরে অবস্থা শ্রমিক শ্রেণীর অনুকূলে এগিয়ে চলল; সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। যে স্পাক চক্র আন্দোলন আহ্বান করেনি তারা বুঝল আন্দোলনের নেতৃত্ব বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর হাতে চলে যায়। সুতরাং হাঁক ডাক করে তারা তখন আন্দোলনে নেমে পড়েই ভেতর থেকে তাকে 'সাবোতেজে'র চেষ্টা করতে লাগল। ঘন ঘন শলা পরামর্শ চলল রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে এবং আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকতা করে রফা করল তারা। শ্রমিকদের ধাপ্পা দিয়ে রাজাগিরি তারা কায়েম রাখল। লিওপোল্ড নামে সিংহাসন ত্যাগ করেও কার্য্যতঃ রাজা রইলেন এই রফা অনুযায়ী। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁর ছেলের অভিভাবক হিসাবে তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন।

বিপ্লবী জনতা বেলজিয়াম সোস্যালিষ্ট পার্টির এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলল না। তারা নিজেদের দৌর্বল্য দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করল। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করার জন্য বেপরোয়া গুণ্ডামী আরম্ভ করল। প্রতিক্রিয়ার এই গুণ্ডামী চূড়ান্ত রূপ নিল বেলজিয়াম কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি কমরেড জুলিও লাহাউতের হত্যায়। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বেলজিয়াম শ্রমিক শেণী ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তারা জানিয়েছে এই হত্যার উপযুক্ত জবাব তারা দেবেই দেবে।

ইঙ্গমার্কিণ কর্ত্তারা নিজেদের গণতন্ত্রী বলে ঢাক পেটেন, এই ঢাক পেটানোর লক্ষ্য হল জনসাধনকে ধাপ্পা দিয়ে নিজেদের মতলব হাঁসিল করা। যে ফ্রাঙ্কোকে সারা পৃথিবীর প্রগতিবাদী জনতা গোঁড়া ফ্যাসিষ্ট বলে জানে, হিটলার মুসোলিনীর যিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে কুনাম কিনেছেন, যাঁর রাজত্বে লাখে লাখে প্রগতিবাদী লোককে পশুর মত হত্যা করা হচ্ছে, তাঁকে এইবার প্রকাশ্য জাতে তুলে নিল ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অবশ্য ইঙ্গ মার্কিন কর্ত্তা আর ফ্রাঙ্কোর মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। তাই বন্ধুত্ব তাদের পাকাপোক্ত হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

মার্কিন সেনেট ফ্যাঙ্কোকে ১০ কোটী ডলার ধার দিয়েছে। ধার দেবার কারণ ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সিনেটর ষ্টাইলস্ ব্রিজেসের কথা হতে। তিনি জানিয়েছেন—"স্পেনের অবস্থান সামরিক দিক হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যুদ্ধের সময় ব্যবহারের জন্য সেখানে সামরিক ঘাঁটী গাড়ার চেষ্টা আমাদের না করার কোন কারণ নেই।" এ কথার একমাত্র সোজা মানে হয় অতলান্তিক চুক্তির নাম করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে মার্কিন যে যুদ্ধ ঘাঁটী গড়ে চলেছে সোভিয়েট ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে, ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোকে সেই দলে স্থান দেওয়া হল সাদরে।

এতে অবাক হবার কিছু নেই অবশ্য। হিটলারের আমলের প্রধান নাৎসী নেতাদের ত পুরা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে পশ্চিম জার্ম্মানীতে নতুন করে সামরিক দল গোড়ে তোলায়। আগের দিনের সামরিক অফিসারদের অধীনে জার্ম্মান বাহিনীকে অস্ত্র সজ্জিত করা হচ্ছে। মুসোলিনীর সামরিক উপদেষ্টা ও কর্ত্তাব্যক্তিদের বেকসুর খালাস দেওয়া হচ্ছে—সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করার জন্য। এর পরও ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য না করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

মধ্য প্রাচ্যের তেলের খনি, তার বিমান পথ প্রভৃতি নানা বিষয় ওয়াল ষ্ট্রীটের কর্ত্তাদের মুঠোর মধ্যে অনেকদিন হল চলে গিয়েছে। সামরিক ঘাঁটীও গড়ে তোলার কাজ চলছিল। সেই কাজ যাতে আর দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় সেই কারণে সৌদি আরবকে ৪ লাখ ডলার ধার দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই টাকা এখনই দেওয়া হবে এবং এর সাহায্যে সৌদি আরবে দুটি বিমানঘাঁটী একটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হবে।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

রিলিফের কাজে কি কি করতে হবে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রিলিফের কর্মসূচীতে থাকবে—১] যেখানে যেখানে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে হবে। ২] বিনা মূল্যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে হবে। ৩] বিনা খরচে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। ৪] বর্ত্তমানে জিনিষ পত্রের যে চড়াদাম চালু আছে তাকে কমিয়ে এনে জনসাধারণের ক্রয় শক্তির মধ্যে দাঁড় করাতে হবে কারণ তা না করলে জনতাকে উপোষ করে মরতেই হবে কাগজে পত্রে সব ভাল ভাল ব্যবস্থা লেখা থাকা সত্ত্বেও। ৫] দেশের সর্ব্বত্র কণ্ট্রোল প্রথা ও রেশনিং চালু করতে হবে। তথাকথিত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রেরই কণ্ট্রোল নয়, প্রতিটি জিনিষেরই সর্ব্বাত্মক কণ্ট্রোল চাই, তা না হলে চোরাকারবারীর রাজত্ব চলতে বাধ্য। ৬] সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন নীতি বদলিয়ে গরীব দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূলে তা চালিত করতে হবে। জোতদার জমিদারদের খাদ্য শস্যের গোলায় হাত না দিয়ে গরীব চাষীর যথা সর্ব্বস্ব যে ভাবে লুঠ করে নেওয়া হচ্ছে একরকম নাম মাত্র দামে, তাকে রোধ করতেই হবে। ৭] খাদ্য শস্য সরকার যে দামে কিনবে সেই দামেই তাকে বেচতে হবে। আজ যেমন সরকার ৭৷৷০ টাকা করে ধানের মণ কিনে চাল ১৭৲ টাকা করে বিক্রী করছে তা চলবে না। ধানের কেনা দাম ৭৷৷০ টাকা হলে চালের বিক্রী দাম ১১।০র বেশী হবে না যেহেতু দেড়মণ ধানে একমণ চাল হয়। বিদেশ থেকে যে দামেই কিনতে হক না কেন দেশের এই হিসাবে বিক্রী দামের চেয়ে তাকে বেশী দামে বিক্রী করা চলবে না। ৮] রেশনিংয়ে শ্রেণী বিভাগ করে গরীব জনসাধারণকে যে ভাবে নানা জিনিষ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা চলবে না; খাদ্যবণ্টন সমান হওয়া চাই। কায়িক শ্রমজীবিদের জন্য এই হিসাবমত পরিমাণ ছাড়াও বিশেষ পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে। ৯] সর্ব্বত্র 'কনসিউমারস সোসাইটী' গড়ে তুলতে হবে বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বাধীনে। সরকার এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল—কংগ্রেস, হাজার হাজার ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, তারা জন স্বার্থ রক্ষা করতে নারাজ। জনতা খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে মরছে; সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতবর্ষকে খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে সরবরাহ করতে প্রস্তুত—তার দাম আমেরিকা থেকে কেনা খাদ্যের দামের চেয়ে কমও বটে—তবুও ভারত সরকার তা কিনবে না। লোকে খেতে পাচ্ছে না আর খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের জমি শিল্পের কাঁচামাল তৈরীর কাজে লাগান হচ্ছে। এই ধরণের দুষ্কর্মের উদাহরণ দিতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। সুতরাং কংগ্রেসী নেতৃত্বে কনসিউমারস সোসাইটী গড়লে তা এখানকার ফুড কমিটির মত চোরা কারবারীদের বিচরণস্থলই হবে। সুতরাং কনসিউমারস সোসাইটীর নেতৃত্ব থাকবে বামপন্থী দলগুলির হাতে। উপরন্তু এদের গঠনতন্ত্র এমন হবে যাতে গরীবের দলের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে বড় লোকদের জিনিষপত্র ব্যবহারের (কনসামসান) ওপর। এই ভাবে সংগঠন গড়ে তুললে সাধারণ লোকে কণ্ট্রোল প্রথা সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস আছে তা ধীরে ধীরে কেটে যাবে। ১০] সর্ব্বশেষে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সমগ্র বিষয়টি যুদ্ধ প্রয়োজন ভিত্তিতে (ওয়ার ইমার্জেন্সি বেসিস) সমাধান করতে হবে।

এর সঙ্গে দুর্ভিক্ষের মূল কারণগুলি দূর করতে হবে নয়ত কয়েক বছর অন্তর এই দুর্ভোগ ভুগতেই হবে।

বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার বিলোপ ও চাষীর মধ্যে জমি বিলি চাই

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ নিহিত আছে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ করে তার মান্ধাতার আমলের ভূমি ব্যবস্থায়। আমাদের এই বাংলা দেশে—দেশ ভাগ হয়ে যাবার আগে—কৃষি কাজে যত লোক খাটত তার ১০০ জনের মধ্যে ৩৬ জনের কোন জমি ছিলনা, সাড়ে ১৭ জনের জমি ৩বিঘেরও কম। তাহলে দেখা গেল মোট কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৫৪ জনের হাতে কোন জমি নেই বল্লেই হয়। যদি একেবারে নেই বল্লে কারও আপত্তি হয় তাহলে অঙ্ক কষে বল্লে দাঁড়ায়—শতকরা ৫৪ জন কৃষক পরিবারের হাতে মোট জমির শতকরা ৬ ভাগ। এই গেল একদিকে; অন্যদিকে শতকরা ১৪ জন অকৃষকের হাতে মোট জমির শতকরা ৬৩ ভাগ। তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াল এই-একদিকে কোটী কোটী চাষীর হাতে কোন জমি নেই অন্যদিকে জমিদার ও পয়সাওয়ালা লোক প্রায় সমস্ত জমির মালিক। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লক্ষ্য হল শুধু লাভ, জমির উন্নতি, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষ করার কোন চেষ্টাই এদের নেই। আর চাষী? সে দেনার ভারে কুঁজো হয়ে পড়েছে, খেতে পায়না, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, জমি বিহীন ভিক্ষুক। ফসল ফলাবে কে? ফসলের পরিমাণ বাড়াতে হলে বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটাতে হবে রাজা মহারাজাদের জমিও সম্পত্তি কেড়ে নিতে হবে ও চাষীর হাতে জমি বিলি করে দিতে হবে। এরসঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা কৃষি সংস্কার ঘটাবার দরকার পড়বে। এখন যে রকম উঁচু হারে খাজনা বাঁধা আছে তাকে কমাতে হবে, যে জমিতে লাভ হয় না তার খাজনা মকুব করতে হবে, বর্ত্তমানে সমস্ত চাষীর যত ঋণ আছে তা মকুব করে দিতে হবে, নতুন কৃষি সাহার্য্য ব্যবস্থা করতে হবে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের সুবিধা ও শিক্ষা দিতে হবে, আইন করে জমি কেনা বেচা বন্ধকরে দিতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলেই তবে দুর্ভিক্ষকে বাধা দেবার সুযোগ আসবে।

ব্যাঙ্কগুলির জাতীয় করণ ও বিদেশী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাঙ্কগুলিই হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলিকে অক্ষত রেখে, তাদের জাতীয় করণের চেষ্টা না করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে পরিবর্ত্তন করার কথা বলা হয় পাগলামী নয় ধোকা দেওয়া। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মকে শাসন ও চালিত করতে না পারলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের বেচা কেনার গায়ে হাতও দেওয়া যাবে না। তাই জমিদারী প্রথার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় করণ করতে হবে।

এর সঙ্গে বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করতে হবে সমস্ত বিদেশীয় সম্পত্তি। ভারতবাসীর রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফল লুঠে নিয়ে চলে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীর মুনাফাখোরের দল। দীর্ঘ দিন রাজনৈতিক পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েথাকে, আমাদের দেশে কেন হবে না? আর সেই কাজ করে ও সব দেশের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দিয়েছে—বেকার সমস্যা নেই, জনতার জীবন ধারণের মান ক্রমশঃ বাড়ছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্রুত প্রসার হচ্ছে। স্বাধীন বলে দাবী করলে আমাদের দেশেও এই সব কাজ করতে হয়। বিশেষ করে তা করলে যখন বেকার সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হয়, রাষ্ট্রের পক্ষে আয়ের মাত্রা বেড়ে যায়, জনউন্নয়ন পরিকল্পনা করার উপায় দেখা দেয় তখন বিদেশী সম্পত্তিকে অক্ষত রাখার অর্থ হল জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। প্রকৃত অর্থে জাতীয় অর্থনীতি গড়তে হলে বিদেশী পুঁজি ও সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করতেই হবে।

পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রাক পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভেদ এইখানে যে, পুঁজিবাদ এর বিভিন্ন শাখার মধ্যে এক পরস্পর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বিশেষ করে একচেটে পুঁজিবাদের যুগে যখন ব্যাঙ্কগুলিই উৎপাদনের ওপর প্রভুত্ব করে তখন ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় করণ করতে গেলে অন্যান্য প্রধান শিল্পগুলিকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হয়। সুতরাং ভারতবর্ষে লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, তেল, চিনি, কয়লা, শক্তি উৎপাদক প্রভৃতি যে সমস্ত প্রধান শিল্প আছে তাদের ও জাতীয় করণ করতে হবে। এই সব শিল্প যদি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তাহলে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় জন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে দ্রুতগতিতে সফল করতে সক্ষম হবে।

কংগ্রেসী সমকার এ কাজ করবে না, অথচ এ সব সংস্কার না করতে পারলে

প্রধান শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে

বিদেশী পুঁজিপতির দল কোটী কোটী টাকা বছরে লুঠে নিয়ে গিয়েছে ভারত থেকে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বলছেন-দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আজও কেন বাংলার পাট কলের শতকরা ৮০টির মালিক ইংরেজ ব্যবসায়ী? কেনই বা ভারতীয় চাএর বাজার ইংরেজের হুকুমে চালিত হয়? কেনই বা যানবাহন, ইলেকট্রিক, লোহা ও ইস্পাত, তামা, খনি প্রভৃতির মালিক ক্লাইভ ষ্ট্রীটের প্রভুরা? কেনই বা এখনও বছরে কোটী কোটী টাকা মুনাফা হিসেবেবিদেশে চলে যাচ্ছে? কোন্ খাঁটী স্বাধীন রাষ্ট্রে এই রকম শোষণ চালাতে দেওয়া হয়? নয়া-গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে যদি বিদেশী সম্পত্তি ও সাধারণ ভারতবাসীর স্থায়ীভাবে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার অন্য কোন পথও নেই। সুতরাং ভারতীয় জনতাকেই এগিয়ে আসতে হবে নিজেদের এই দাবীগুলি পূরণের চেষ্টায়। আর তা চাইলে তার জন্যে সংগ্রাম করতেই হবে। শ্রমিক শ্রেণীই একমাত্র ও সম্পূর্ণ বিপ্লবী শ্রেণী। তার বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে টেনে আনতে হবে প্রতিটি ভারতবাসীকে যারা দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচতে চায়, সুখী শান্তিপূর্ণ শোষণহীন সমাজ গড়তে চায়। কোন কথা বলেই এ সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকা চলে না। জনতার ঐক্যবদ্ধতার অভাব ও সংগ্রাম বিমুখতার সুযোগ নিয়ে এবং কৌশলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে কংগ্রেসী

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই এই সব কাজ করাতে পারে

3/11
SO[illegible] CENTRE OF INDIA
([illegible])
48, Dhar[illegible] Street, Calcutta-13.

১৫ই আগষ্টের মেকী স্বাধীনতার প্রতিবাদে লক্ষ লক্ষ জনতা

কংগ্রেসী দুঃশাসনকে চূর্ণ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

জনতার দাবী

কমনওয়েলথ ছাড়তে হবে
ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধশিবিরে থাকা চলবে না
শান্তির শিবিরকে জোরদার করতে হবে
জমিদারী প্রথার বিলোপ ও চাষীর হাতে জমি চাই
বাঁচার মত মজুরী, চাকুরী ও শিক্ষা দিতে হবে
নাগরিক অধিকারে হাত দেওয়া চলবে না

১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসী সরকার 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষণা করেছেন—

এদিনটি কংগ্রেসীদের গদীতে চাপবার দিন; সরকার নির্দ্দেশ দিয়েছিল এদিনে উৎসব করতে। কিন্তু ১৫ই সকাল থেকে সারাদিনে দেশের সাধারণ লোকের কোথাও কোন উৎসব করতে দেখা যায়নি—

বেকারী, জিনিষপত্রের অসম্ভব রকম মূল্য বৃদ্ধি আর ঘনায়মাণ দুর্ভিক্ষের পদছায়া জনসাধারণের মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে—মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিয়েছে। উৎসব করবে কে? যাদের নিয়ে দেশ; যারা দেশের জনসাধারণ তাদের আজ অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই। কংগ্রেসী সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দাপটে আজ কয়েক লাখের উপর দেশবাসী বেকার—বড় বড় ধনপতি আর মিল মালিকদের কল্যাণে দেশের বস্ত্র আজ বিদেশের বাজারে—ফলে দেশের মেয়েদের লজ্জা ঢাকবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করতে হয়েছে—সরকারী কণ্ট্রোল নীতি আর চোরা কারবারীদের আশীর্ব্বাদে দেশের বহু জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, মানুষেরা ভুখা মিছিল করে খাদ্য দাবী করছে। এর উপর বাস্তুহারারা ত আছেই গদী চড়বার লোভে 'দেশভক্ত' কংগ্রেস সেবীরা দেশবিভাগে রায় দিয়েছিলেন—ইংরাজের সাথে আপোষ করে কমনওয়েলথের অধীনে 'স্বাধীনতা' পেয়েছেন; ফলে মিলেছে হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান—হাজার হাজার লোক সীমান্ত পার হয়ে পূর্ব্ব পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে কংগ্রেসীদের ছত্র ছায়ায় দিন যাপনের আশায় এসেছিল, আজ পর্য্যন্ত মাথা গুজবার স্থানটুকুও পায়নি। তার উপর এল দাঙ্গা—

পাকিস্থানের লীগ সরকার আর হিন্দুস্থানের কংগ্রেসীরা—নিজেদের গদী বাচিয়ে রাখবার মোহে, জনতার বাঁচার লড়াই আর জঙ্গী একতা ধ্বংস করবার জন্যে উস্কানি দিয়েছিল দাঙ্গার—সাম্প্রাদায়িক প্রতিষ্ঠান গুলিকে আইনসঙ্গত ভাবে সাম্প্রাদায়িকতা প্রচারের সুযোগ দিয়ে ও আরও নানপ্রেকারের সাহায্য ক'রে দাঙ্গা বাধাতে সক্ষম হয়েছিল। সেই দাঙ্গার ফলে এসেছে পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ' মানুষ বাস্তু ত্যাগী হ'য়ে—শিয়ালদহর প্লাটফরমে আর তথাকথিত শিবিরগুলিতে ভিড় করে মরছে তারা—এই ত আজ দেশের অবস্থা।

এ অবস্থায় সরকারের উৎসব করবার আবেদনে দেশবাসী সাড়া দেয় নি, তারা সাড়া দিতে পারে না। উৎসবের পরিবর্ত্তে জনসাধারণ ঘৃণা প্রকাশ করেছে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে।

জনগণের মনে সমস্ত ব্যথা আর লাঞ্ছনা ধীরে ধীরে জমা হ'চ্ছিল—প্রতিবাদের ভাষা হয়ত সব সময়ে ঠিক মত তাঁরা খুজে পায়নি। কিন্তু পুঞ্জীভূত ঘৃণা বিদ্বেষ আজ ভাষা পেয়েছে, মুর্ত্ত হয়েছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে। দৃঢ়চিত্তে দেশের সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছে ১৫ই আগষ্টের চরম বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে। জনসাধারণের প্রস্তুতি হয়ত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সংগঠন আজও দুর্ব্বল. জাগরণ পূর্ণ রূপ নিতে পারেনি কিন্তু তাই বলে আজ আর তারা নিশ্চেষ্ট নয়, নির্ব্বাক দর্শকের মত শুধু হাত তালি দেয় না। 'স্বাধীনতার' ঠুটো ঠাকুর এখন আর মোহ সৃষ্টি করতে পারে না…এ ঠাকুরের যে কিছু নেই, সবটাই যে মিথ্যা এ চরম সত্য এতদিনে ওরা বুঝেছে।

তাই দেখেছি গত ১৫ই আগষ্টে দেশে এক নতুন রূপ। দেশজোড়া মানুষ সেদিন জমা হয়েছিল রাস্তায় আর পার্কে—আনন্দ করতে নয় প্রতিবাদ করতে, মেকী স্বাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে। ১৫ তারিখে জনগণের যে ভাষা শুনেছি, যে নতুন পদক্ষেপ দেখেছি তা কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল—২৯শে জুলাই এর ঐতিহ্য বহন করে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য দিবসে এবার ময়দানে জড়ো হয়েছিল কলকাতার কয়েক হাজার ছাত্র, কেরাণী শ্রমিক—তাদের কণ্ঠে আওয়াজ ছিল কংগ্রেসী সরকারের সকল রকমের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তারপর ১৫ তারিখের ঠিক দুদিন আগে ময়দানে বাস্তুহারা সম্মেলন—প্রায় ৫০ হাজার বাস্তুহারা সেদিন জড়ো হয়েছিল তাদের পুণর্বসতির দাবী সফল করবার সংকল্প নিয়ে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে তারা দেখিয়েছে কি অবস্থায় বাস্তুহারারা দিন কাটাচ্ছে। —শোভাযাত্রা করে তারা বেরিয়েছিল—ধ্বনি দিয়েছিল 'বাস্তুহারা করল কারা—গদি চেপে বসল যারা'। সেই ৫০ হাজার বাস্তুত্যাগী মানুষের মিছিল কলকাতার রাজপথে যে আওয়াজ তুলেছে, বহরমপুরে ভুখা মিছিল—অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের সহজ দাবী—'খাদ্য চাই' যে চেতনার সৃষ্টি করেছে তাই পূর্ণরূপ নিয়েছে ১৫ই আগষ্টে কলকাতায় ও সহরতলীতে—সমস্ত দেশে।

হাজার হাজার মানুষ সেদিন রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে—কোন বাদ্যধ্বনি নয়—সুবেশ ব্যাণ্ড বাদকের দল নয়—চোঁখধাঁধান আলো বা আগুণের হলকা-তোলা বাজী নয়—নেতাদের বাণী কিংবা ভাষণও নয়—উৎসবের বিন্দুমাত্র আভাসও নেই—শুধু দেখা যাচ্ছে শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা—ছাত্র, যুবকের, সহরতলীর শ্রমিকের ডালহাউসির কেরাণী মধ্যবিত্তের আর বাস্তুহারাদের—প্রতিবাদ শোভাযাত্রা। ঝাণ্ডা আর ফেষ্টুনে লাল হয়ে গিয়েছিল কলকাতার রাজপথ—পোষ্টারে পোষ্টারে লেখা ছিল বিভিন্ন দাবী, আঁকা ছিল নানা রকমের কার্টুন। কংগ্রেসী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী।

কংগ্রেসীরা সেদিন কোন প্রোগ্রামই রাখেনি—কোন পার্কে দেখা যায় নি কোন কংগ্রেসী নেতাকে ভাষণ দিতে। আজকাল জনসাধারণের সামনে আসতে ওরা ভয় পায়। শুধু লাট বাহাদুরের বাড়াতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলে নাকি চরকা কেটেছেন। প্যারেড গ্রাউণ্ডে মিলিটারী ও পুলিশের সামরিক প্যারেড হয়েছে; দু একজন কংগ্রেসী মন্ত্রী রোটারী ক্লাবে সাধারণ মানুষের গণ্ডীর বাইরে বড় বড় অভিজাতদের আসরে ভাষণ দিয়েছেন। আর দেখা গেছে বড় বাজার থেকে ডালহাউসি ও চৌরঙ্গির বড় বড় প্রাসাদে দেশী ও বিদেশী নামজাদা অফিস গুলোতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। মনে পড়ে গেল ইংরাজের আমলে প্রতি ১লা জানুয়ারি নানারকমের উৎসব হতো—সে আমলেও বৃটিশ প্রভুদের ইচ্ছায় ভারত সরকার উৎসব করবার নির্দ্দেশ দিত; উৎসবের অনুষ্ঠান হিসাবে দেখা যেত এই প্যারেড গ্রাউণ্ডে গোরাদের সামরিক কুচকাওয়াজ, লাট ভবনে ডিনার আর বড় বড় অফিসে ইউনিয়ন জ্যাক। সাধারণ ভারতবাসীর সাথে ঐ উৎসবের কোন যোগই ছিল না—কিছু লোক হয়ত অবাক বিস্ময়ে সে জাঁকজমক চেয়ে দেখত। ১৫ই আগষ্টের সাথে আগের আমলের পার্থক্য শুধু ডিনার পার্টির বদলে চরকা কাটা—গোরার বদলে কালা, ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্ত্তে তেরঙ্গা।

সোস্যালিষ্ট ইইনিটি সেণ্টারের আহ্বানে ১০ হাজার জনতার সমাবেশ হয় কলকাতার হাজরা পার্কে। লাল ঝাণ্ডার লাল রঙে দিগন্ত বুঝিবা লাল হয়ে গিয়েছিল; গ্র্যানাইট শক্ত মানুষের তীব্র ঘৃণা মুহুর্মুহু ফেটে পড়ছিল স্লোগানে স্লোগানে আর কেঁপে কেঁপে উঠছিল পাহারারত পুলিসের দল। বক্তার পর বক্তা উঠলেন, করতালি আর সমর্থনে উত্তেজনা ফেটে পড়ে। বক্তাদের মুখ দিয়ে জনতার দাবী নির্গত হয়, জনতা তার সমর্থনে আকাশ ফাটান ধ্বনিতে বাতাস চিরে খান খান করে দেয়। কমরেড প্রীতিশচন্দ্র কংগ্রেসী সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে জনতার মুখে চোখে ফুটে ওঠে প্রতিকারের স্থির সঙ্কল্প। তারপর কমরেড শিবদাস ঘোষ বক্তৃতা করতে উঠলেন।—ফেটে পড়ল হাজার হাজার কণ্ঠে কমরেড ঘোষ জিন্দাবাদ'। বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, তিনি—বাজে আবেগ নয়, সস্তা প্যাঁচ নয়, যুক্তির বন্যা—কি করতে হবে, সংগঠন কেন গড়বো, কি ধরণের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, কেমন করে বিপ্লব সফল করতে হবে। জনতা বুঝল দিন পালটে গিয়েছে, বক্তৃতার ধারা বদলে গেছে। শুনলাম সভায় এক বৃদ্ধ তাঁর সঙ্গীকে বলছেন—"নতুন ধারায় বক্তৃতা। এতদিনত এত বক্তৃতা শুনলাম, এমন' ধারা শুনিনি। সস্তা হাততালি পাওয়া চটকদার বক্তৃতা নয়। কাজের কথায়ভর্ত্তি, সোজা কথায় সকলের বোঝারমত করে কঠিন জিনিষকে জল করে বলা। ভঙ্গিটা ও বক্তব্য চমৎকার।" বুঝলাম জনতা চিনতে শিখছে—অতীত ভাঙছে, নতুন বেড়ে উঠছে দ্রুত গতিতে। তারপর সভাপতি কমরেড নীহার মুখার্জ্জী উঠলেন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের শক্তিকে জোরদার করে তুলে ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রস্তুতিকে গোড়ে তোলার আহ্বান তিনি দিলেন। সভা সাড়া দিল ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে। তারপর এক বিরাট মিছিল সারা দক্ষিণ ক'লকাতা প্রদক্ষিণ করে বালিগঞ্জে শেষ হয়। ১৪ই রাত্রে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সমস্ত কার্য্যালয়, গণদাবী হামারীপথ অফিস, বহু কর্মীর বাসস্থান তল্লাস করে ও ভয় দেখিয়ে কর্মীদের প্রতিবাদ সভা ব্যর্থ করতে পারল না পুলিশ বিভাগ।

সমস্ত ধনবাদী দেশের অর্থনীতির ওপরে মার্কিন ধনকুবেরদের আক্রমণ

লেখক :—ই, ভার্গা

মার্কিন ধনকুবেরদের পক্ষে যাঁরা ওকালতী করেন তাঁরা এই ধারণাটাই ছড়াতে চাচ্ছেন যে আমেরিকা সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করছে। আসলে কিন্তু মার্কিন ধনকুবেররাই ধনবাদীর দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকটের মূল। ধনবাদের সাধারণ সংকট ক্রমশঃ বেড়ে চলছে এবং আমেরিকাতেই সেই সংকটের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। এই সংকটের বোঝা মার্কিন ধনকুবেরা অন্য দেশগুলির ওপর চাপাবার চেষ্টা করছে।

মার্কসবাদের নির্ভুলতার আরো প্রমান

ধনবাদের বর্ত্তমান গতি মার্কসের এই বক্তব্যই প্রমাণ করে যে "ধনবাদের বিশিষ্ট অবস্থায় উদ্বৃত্ত মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত লোক সংখ্যার সৃষ্টি হয়।" ঠিক এই অবস্থা আজ আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে; সমস্ত রকমের মূলধনেই সেখানে উদ্বৃত্ত জমা হচ্ছে। ধনবাদের সাধারণ সংকটের সময়ে উৎপাদনক্ষমতার অনেকখানিই অকর্মন্য হয়ে বসে থাকে এবং ব্যাপক ভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়, যেন দুটি দুরারোগ্য ব্যাধি।

উদ্বৃত্ত উৎপাদনী মূলধনের অস্তিত্বের প্রমাণ হল হাজার হাজার কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বাজারের অভাবে বহু কলকারখানায় সামর্থ্যের চেয়ে কম কাজ হওয়া। এমনকি মোটরগাড়ী শিল্পেও সামর্থ্যের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী কাজ হচ্ছেনা, যদিও মোটর গাড়ীর বাজার এতদিন মন্দ ছিলনা।

পণ্যের মূলধন যে কতখানি উদ্বৃত্ত হয়ে চলেছে তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে ১৯৪৯ সালে শিল্প এবং খুচরা ও পাইকারী ব্যবসার ক্ষেত্রে ৬ হাজার কোটি ডলার মূল্যের পণ্য বাজারের অভাবে মজুত হয়ে পড়ে থাকে।

ঋণ দেবার মূলধন ও কম জমা হয়নি ব্যাংকে জমা হয়ে আছে ৮৫০০ কোটি ডলার। ধনবাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ঋণদান ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ অনুৎপাদক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা হয়। সেই জন্যই গর্ভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটছে আমেরিকায় আজ ২৫০০০ কোটি ডলার। ওদিকে মার্কিন রাজকোষে জমা হয়ে আছে ২৫০০ কোটি ডলার মূল্যের সোনা; ২৮০০ কোটি ডলার মূল্যের যে নোট বাজারে চালু ফাঁপাইএর ফলে সেগুলোর দাম কমে গেছে।

অবশ্য এই সমস্ত উদ্বৃত্ত মূলধন আপেক্ষিক (Relative)। ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ বাজারের ওপর এই উদ্বৃত্তিকে নির্ভর করতে হয়।

অর্থনৈতিক সঙ্কট হ্যাঁ করে এগিয়ে আসছে

অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে অর্থনৈতিক সংকট। আমেরিকায় পুরা ও আধা বেকার মিলিয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ এবং কৃষি সংকটের ফলে কৃষিজীবি লোক সংখ্যার অত্যাধিক বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সংকটেরই লক্ষণ। অবাধপ্রতিদ্বন্দ্বিতার অবস্থায় মূলধনের প্রচলনকে বিশ্লেষণ করে মার্কস লিখেছেন :—"মূলধনকে মূলধন হিসাবে কাজ করতে হবে বলে এবং মূলধনের মূল্য বাড়া চাই বলে, পুরোনো মূলধনের কিছু অংশ সব অবস্থাতেই অকেজো হয়ে বসে থাকতে বাধ্য এবং মূলধন হিসাবে তার (সেই অংশের) ধর্ম্ম ও (property) কোন কাজে আসে না। মূলধনের কোন্ বিশিষ্ট অংশটি অকেজো হয়ে থাকবে সেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর নির্ভর করে।" (ক্যাপিটাল, রুশ সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন এবং একচেটে ব্যবসায়ীদের উত্থানের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপই গিয়েছে বদলে অর্থাৎ অখণ্ড আধিপত্য এসে গিয়েছে একচেটে ধনিকদের হাতে। মূলধন উদ্বৃত্ত থাকার সময়ে উঁচুহারে মুনাফা শিকার করতে গিয়ে মার্কিন একচেটে ধনবাদ অন্য ধনবাদী দেশগুলোর বৈষয়িক সর্ব্বনাশ করছে। স্বদেশী বাজারে ইচ্ছে করে বাজার দর বাড়িয়ে একচেটে ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফা শিকারের পথ সুগম করছে। স্বদেশী বাজারে সস্তাদরের বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগীতাকে বন্ধ করলে তবেই এই অতি মুনাফার অগ্নিমূল্য বজায় রাখা সম্ভব। এই জন্য শুল্কের উঁচু প্রাচীর তৈরী করা হয়।

শুল্কনীতির পরিবর্ত্তন

আধুনিক ধনবাদের শুল্কনীতিতে এক লক্ষ্য করার মতন পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে শুল্ক এক কালে অগ্রসর দেশের পণ্যের প্রতিযোগীতার হাত থেকে অনগ্রসর দেশের তৈরী পণ্যকে রক্ষা করত, সেই শুল্ক আজ বড় বড় ধনকুবেরদের স্বার্থ রক্ষা করছে। ব্রিটিশ মোটর গাড়ী আমেরিকার বাজারে পাঠালে তার জন্য শুল্ক দিতে হয় দামের শতকরা ১০ ভাগ যদিও মার্কিন মোটর শিল্পে মোটর নির্ম্মাণের খরচ অনেক কম। আমদানী পশমের পণ্যের জন্য শুল্ক দিতে হয় শতকরা ৩৫ ভাগ। মার্কিন শুল্ক বিভাগের কর্ত্তারা আরো নানা কায়দায় পয়সা আদায় করেন। শুল্ক আইনের বই খানির হাজার হাজার পাতা এবং সেটির ওজন ২ কিলো গ্রামের বেশী। আইনগুলো অত্যন্ত জটিল। যেখানেই কোন সন্দেহ জাগে, সেখানেই শুল্ক কর্ম্মচারীরা যতখানি পারে পয়সা আদায় করে নেয়। গেল বছরের নভেম্বরে মার্কিন বৈদেশিক মন্ত্রী আচিসন স্বীকার করেন যে কখনো কখনো আমদানী কারকের শুল্ক-আইন বুঝতে ৫ বৎসর লেগে যায়। এক সময় শুল্কই পণ্যের দামের চেয়েও বেশী হয়ে যায়। মেলন গোষ্ঠীর কোম্পানী 'এলকোয়ার' (এলুমিনিয়ম কোম্পানী অব আমেরিকা) বড় কর্ত্তা ছিলেন এককালে আমেরিকার কোষাধ্যক্ষ। ১৯৩০ সালের আগে এলুমিনিয়ামের শুল্ক হার ছিল প্রতি পাউণ্ডে ৭ থেকে ১১ সেণ্ট। ১৯২৬ সালে এলকোয়াতে ২০ কোটি পাউণ্ড এলুমিনিয়াম হয়। অর্থাৎ কোম্পানীর মুনাফা বাড়ল বছরে অন্ততঃ এক কোটি ডলার। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে শুল্ক কমিয়ে হোল ৪·৭ সেণ্ট। কিন্তু কোম্পানীর উৎপাদন তখন অনেক বেড়ে গিয়েছে (১৯৪০ সালে ৪০ কোটি পাউণ্ড) অর্থাৎ মুনাফা বাড়ল ২ কোটি ডলারের বেশী।

বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে লড়াই

মার্কিন ধনিকেরা সেই সব জিনিষ তৈরী করতে আরম্ভ করল যেগুলো আগে তাঁরা আমদানী করত। ১৯৩৭ সালে আমেরিকা মোট আমদানী করেছিল ৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার দামের। মোট আমদানীর একের ৬ ভাগ ছিল রবার, রেশম উদ্ভিজ্জ তেল। সোয়াবীনের ১৯৪৮ সালে দাম যখন দ্বিগুণ হয়ে গেল তখন ধনিকেরা এই জিনিষগুলো আনল মোটে ৩২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার পরিমাণ। ওদিকে যে সব জিনিষ আগে কখনো রপ্তানী হোতনা (কয়লা আর সুতার কাপড়) সেগুলি যুদ্ধের পর রপ্তানী হচ্ছে।

মার্কিন উদ্বৃত্ত মাল গাদা করবার জন্য মার্শালীকরণ

স্বদেশী বাজারে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করাটাই একচেটে দাম বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্বদেশী বাজার চড়া দাম বজায় রাখার জন্য মার্কিন ধনিকেরা বিশ্বের বাজারে নিজেদের দেশের উদ্বৃত্ত মাল গাদা করে দিচ্ছে। তার ওপর ধনকুবেরেরা বিদেশী বাজারে মাল বেচছে এক এক সময় এমন সস্তাদরে যা উৎপাদনী খরচের সঙ্গেও পড়তার পোষায় না। সেই ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিচ্ছে রাজ কোষ থেকে আয়করের টাকায় কামড় বসিয়ে। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে মার্কিন ধনকুবেরেরা বিদেশী বাজারে গাদা গাদা মাল চালান ছাড়াও বিদেশে উদ্বৃত্ত মাল চড়া দামে বেচছে অনেক ক্ষেত্রে। মার্শাল পরিকল্পনা, অতলান্তিক চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ, গ্রীস ইরাণ তুর্কী ইতালিকে অস্ত্র সরবরাহ এগুলো হোল তার উদাহরণ—। রপ্তানী ব্যবসায় সরকারী অর্থ সাহায্য থেকে ধনকুবেরদের দুদিক দিয়ে লাভ। দেশের বাজারে মাল চড়া দামে বিক্রী হয়, বিদেশেও উদ্বৃত্ত মাল লাভজনক দামে বেচা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন শ্রমিকের পক্ষে দুদিক দিয়েই লোকসান। সাধারণ পণ্য তাদের বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয়। ওদিকে রপ্তানীতে সরকার অর্থ সাহায্য করেন বলে শ্রমিকদের ঘাড়ে করের বোঝা বাড়ে।

যুদ্ধের পরে তিন বছরে (১৯৪৬-৪৮) মার্কিন মাল, রপ্তানী হয় ৩৮০০ কোটি ডলার দামের। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালে হয়েছিল মাত্র ৯০০ কোটি ডলার। এই তিন বছরে মার্কিন আমদানী ১৮০০ কোটি ডলারের বেশী হয়নি, অর্থাৎ আমেরিকা বিশ্বের বাজারে যে পণ্য গাদা করেছে তার দাম মার্কিন আমদানীর চেয়ে ২০০০ কোটি ডলার বেশী। সুতরাং ধনবাদীদেশ গুলোর ক্ষতি না হয়ে পারে না। ব্রিটেন এবং অন্যান্য রপ্তানী কারক দেশের সঙ্গে আমেরিকার তফাৎ হোল এই যে ব্রিটেন খাদ্য এবং কাঁচামাল রপ্তানী করে না, আমদানী করে। ব্রিটেন রপ্তানী করে শিল্পজাত পণ্য। কিন্তু আমেরিকা দুই রকম জিনিষই রপ্তানী করে প্রচুর। ফলে যুদ্ধের পরে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর আমেরিকার সঙ্গে বানিজ্যে ডলার ঘাটতি হয়ে পড়েছে। শুধু কয়েকটি বিশেষ কাঁচামাল সরবরাহকারী ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের (তাদের

সংভরক চিলি, টীন ও রবার সংভরক মালয়, পশম সংভরক অষ্ট্রেলিয়া) আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে ঘাটতি নেই।

বাণিজ্য-সম্পর্কে বিভেদ সৃষ্টি

কিন্তু ধনবাদী উৎপাদন পদ্ধতির জন্যই ধনবাদী দেশগুলোর পক্ষে বরাবর আমেরিকা থেকে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী করা সম্ভব নয়। বাণিজ্য সম্পর্কে ফাটল ধরা, দাম দেওয়ার ব্যাপারে গোলমালের ফলে বিশ্বের বাজার কতকগুলি এলাকায় ভাগ হয়ে গিয়েছে যেমন ষ্টার্লিং এলাকা ও ডলার এলাকা।

ধনবাদে যে বহুমুখী বাণিজ্য চলে আসছে তার জায়গায় আজ ২টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলছে; তারপর যেখানে সস্তায় মাল পাওয়া যাবে সেখান থেকে কেনার উপায় নেই তাদের; যে দেশ থেকে রপ্তানীর সমান মূল্যের জিনিষ আমদানীও করা যেতে পারবে সেই খান থেকেই তাদের মাল কিনতে হচ্ছে। ফলে বাণিজ্যটা চলছে শুধু সেই দুটি দেশের মধ্যে। ধনবাদী দেশগুলি ডলার ঘাটতির ফলে আমেরিকা থেকে মাল রপ্তানী কমাতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে ক্ষেত্রে মার্কিন্ রপ্তানীর পরিমান ছিল ৩৭০ কোটি ডলার ১৯৪৯ সালের ঐ কয়মাসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭০ কোটি। কতকগুলি দেশে এরই মধ্যে মার্কিন মাল আনাকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন সরকারগুলিকে এক গোপন চিঠিতে জানান যে মার্কিন তৈলজাত পণ্য যেন তাঁরা কম কেনেন (দেশগুলি বছরে ৫০ কোটি ডলার মূল্যের তৈলজাত পণ্য কিনেছিল)। কোন একজন চিঠিখানা মার্কিন তৈলপতিদের কাছে বিক্রী করে। ফলে মার্কিন সেনেটে একচোট গলাবাজী শোনা গেল। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর পয়সা খাওয়া সেনেটরেরা বৈদেশিক সচিবকে বাধ্য করল ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে। ফলে ব্রিটিশ সুবিধা দিতে বাধ্য হোল।

আমেরিকা শুধু একতরফা রপ্তানী করে যে অন্য ধনবাদী দেশের অর্থনীতির সর্ব্বনাশ করছে তা নয়, পশ্চিম এবং পূর্ব্ব ইউরোপের নয়া গণতন্ত্রের মধ্যে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেও এই দেশগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ইকনমিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশ যে ১৯৩৮ সালে পশ্চিম ইউরোপ ঐ সব দেশের কাছে ১৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দামের খাবার কিনেছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে কিনেছে মাত্র ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের। তারপর জার্ম্মানীর ব্যবচ্ছেদও কম ক্ষতি করছে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারীরা মার্কিন ধনকুবেরদের পরোপকারী প্রমাণ করতে গিয়ে বলে:—একথা সত্য যে গেল তিন বছরে আমেরিকা আমদানীর চেয়ে রপ্তানী করেছে ২০০০ কোটি ডলার বেশী। কিন্তু এই সব দেশগুলো মার্কিন মাল পেয়েছে ঋণ হিসাবে এবং শোধ করতে পারবে কিনা তারও কোন ঠিক নেই। এ হোল কালির ওপর চুণকাম করার চেষ্টা। আসলে ধনবাদদের অধীনে মার্শালীকৃত দেশগুলির পক্ষে ধারে জিনিষ নেওয়ার চেয়ে পয়সা দিয়ে নেওয়াই ভাল ছিল। এদের কেউ যদি আমেরিকার কাছ থেকে কোন জিনিষ পায় তা হলে সে জিনিষ দেশে আর উৎপাদন করা তার চলবে না। ধারে বেশী পণ্য নেওয়া বিশেষ করে এই আমদানী যদি বাধ্যতামূলক হয়, তার ফলে দেশের এই সব জিনিষের কল কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং বেকারের দল হুহু করে বেড়ে চলে। উদাহরণ হোল ফ্রান্স, ইতালী এবং অন্যান্য মার্শালীকৃত দেশগুলো। ফরাসী শিল্প মার্শালীকরণ এবং অতলান্তিক চুক্তির শিকলে বাঁধা। বিমান ও মোটর শিল্পে মার্কিণি মূলধনের আক্রমনের ফলে যুদ্ধের আগেকার তুলনায় ফ্রান্সে বিমানের যন্ত্র তৈয়ারী ১৯৪৯ সালে ১।৫ ভাগ কমে যায়। ১৯৪৮ সালে মোটরগাড়ী শিল্পের সামর্থ্যের তুলনায় মাত্র ১।৩ ভাগ কাজ হয়।

কয়লা সংভরণের অসুবিধার জন্য ফরাসী শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে। মার্শালীকরণের ফলে ফ্রান্সকে কয়লার চাহিদার ১।৫ ভাগ আমেরিকা থেকে আমদানী করা কয়লা দিয়ে মেটাতে হয়। মার্কিণ কয়লার দাম টন প্রতি ৫৮০০ ফ্রাংক অথচ ফরাসী কয়লার দাম ৩৫০০ ফ্রাংক। ফলে ফ্রান্স আর এক খাদের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কয়েকটি প্রধান শিল্পে বিশেষ অবনতি ঘটেছে। দিনে দিনে পুরা ও আধা বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলছে। ১৯৩৩ সালের তুলনায় ফ্রান্সে জীবিকার মান শতকরা ৫০ ভাগ নেমে গিয়েছে।

ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। জাতীয় আয়ে বেতন ভুক শ্রমের অংশ ১৯৩৮ সালের শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে নেমে শতকরা ৩৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ধনিকের অংশ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০'৫ ভাগ যা আগে ১৯৩৮ সালে ছিল শতকরা ২৯ ভাগ।

ফরাসী চাষীদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। মেহনতী চাষীদের জীবনে মার্শালীকরণ ডেকেছে চরম আঘাত। মার্কিণ হুকুমে ফরাসী কর্ত্তারা চাষীদের হুকুম দিয়েছেন কতকগুলি শস্য প্রায় চাষ না করতে বা কম করে চাষ করতে যাতে মার্কিণ ধনিকেরা সেই সব খাদ্যশস্য এনে ফরাসী বাজারে বেচতে পারে।

স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার ফল

সামরিক খাতে খরচ মেহনতকারী জনগণের ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে বসেছে। মার্শালীকৃত দেশের চমৎকার উদাহরণ হোল ফ্রান্স।

মার্শালীকৃত দেশগুলির বৈষয়িক সর্ব্বনাশ, সেগুলির মার্কিণ অর্থনীতির লেজুড় হয়ে যাওয়া এবং শ্রমজীবি জনগণের জীবনযাত্রার মারাত্মক অবনতি এইগুলো হোল স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার ফল। স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় স্বাধীনতাকে মার্কিণ একচেটে মূলধনের কাছে বেচে দিয়েছে।

মার্কিন মালের একতরফা রপ্তানী এবং তার সঙ্গে জড়িত ডলার ক্ষুধার ফলে ধনবাদী দেশগুলির মধ্যে যে অর্থনীতির ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তারফলে মার্কিণ রপ্তানী-ব্যবসাতে ভাটা পড়েছে। তাই নানা নতুন নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে রপ্তানী বাড়াবার শুল্ক কমাবার ইত্যাদি।

নিজেদের উঁচু হারে মুনাফা বজায় রাখার জন্য মার্কিণ কাতলারা যে স্বদেশী বাজারে বিদেশী মাল বিক্রীতে বাধা দেবে, একথা না বল্লেও বোঝা যায়। মার্কিন ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরগুলো যখন বিলাতি (ব্রিটিশ) মাল বিক্রী করতে আরম্ভ করল মার্কিণ ধনিকেরা অমনি শাসাল যে তাদের তাহলে মার্কিণ মাল আর দেওয়া হবে না।

মার্কিণ ধনকুবেররা নিজের দেশের বাজারে যে সব মাল বেচা যায় না সেগুলো ইউরোপে পাঠাচ্ছে থরে থরে সঙ্গে সঙ্গে জলের দরে সেই সব দেশ থেকে মহামূল্য কলা নিদর্শন, ঐতিহাসিক প্রাচীন নিদর্শন এই সব হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজা ষষ্ঠ জর্জের মা কুইন মেরীর নিজে হাতে এমব্রয়ডারী করা একটি কম্বল আজ আমেরিকায় লোককে দেখান হচ্ছে। আমেরিকার সমস্ত বড় বড় নগরে সেটি দেখান হলে পর সেটিকে নীলাম করা হবে। রাণী নিজে নাকি বলেছেন যে নিজের পরিশ্রম দিয়ে তিনি ব্রিটেনের ডলার ক্ষুধার যেটুকু পারেন মেটাতে চান।

মার্কিণরা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে বার বার তাগিদ দিচ্ছে যেন তারা সকলে মিলে একটি অখণ্ড অর্থনৈতিক সমষ্টির মধ্যে একত্র হয়। আসলে এই প্রস্তাব মার্শালীকৃত দেশগুলিকে ষোল আনা পদানত করার জন্য।

মার্কিণ পদ্ধতি

মার্কিণ ধনকুবেরদের উদ্দেশ্য নয় যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর কিছু সাহায্য হোক। তাদের উদ্দেশ্য, দেশগুলোর মধ্যে অবাধে আরো আরো মার্কিণ মাল ঢুকিয়ে দেওয়া এবং রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুইদিক দিয়েই তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনা।

কিন্তু মজার কথা এই যে মার্কিণ নীতি (মার্শালীকৃত দেশগুলি সম্পর্কে) আমেরিকাকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচান দূরে থাক সেই সংকটকে তীব্রতর করে তুলছে এবং সেই সংকটকে পশ্চিম ইউরোপেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

লেনিন-স্তালিনের নীতির সার্থকতা

আজকের দিনে যে সব অকাট্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে এ কথা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে ধনবাদের সংকটের তীব্রতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এই তথ্যগুলি, সাম্রাজ্যবাদ যে পচনশীল মুমূর্ষু ধনবাদ, লেনিন ও স্তালিনের এই উক্তির যথার্থতাকেই প্রমাণ করে দিচ্ছে। একদিকে যেমন সমাজবাদী অর্থনীতি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করে চলেছে, আর একদিকে ঠিক তেমনি ধনবাদ নিজেরই অন্তঃ সংঘাতের ঘূর্ণীতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

পৃথিবীর মানুষ, যতদিন যাচ্ছে তত বেশী করে উপলব্ধি করছে যে মার্কিণ "অর্থনৈতিক সাহায্যের" পিছনে এবং আমেরিকার গোটা নীতির পিছনে যে মতলব লুকান রয়েছে তা হোল আক্রমণাত্মক নানা জোট পাকান, বিভিন্ন জাতিকে পদানত করা ও তাদের লুঠ করা, তাদের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ধ্বংস করা এবং শেষ পর্যন্ত আর একটি যুদ্ধ বাধান। তাই ক্রমশঃই বেশী বেশী লোক শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামীদের শিবিরে এসে যোগ দিচ্ছে, যে শিবিরের নেতা হোল সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন হোল সমাজতন্ত্র, শান্তি ও স্বস্তির দুর্গ।

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সরকার যে দুঃশাসনী শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, সারা দেশ জোড়া তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন, সেই আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেবার চেষ্টা করুন। তাহলেই দেখবেন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো দেখা দিচ্ছে, আজকের মহাশক্তিশালী? পুঁজিবাদ সরকার জনতার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে থারি খাচ্ছে। সেই দিন আনার প্রতিজ্ঞা, তার জন্য জীবন পণ সংগ্রামই হল আজকের কথা. আজকের কাজ।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

বাস্তহারা সংবাদ

সাফল্যের সঙ্গে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ময়দানে প্রায় ৫০ হাজার বাস্তহারা জনতার সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ও সুকোমল দাশগুপ্ত সহসভাপতি ও সহসম্পাদক নির্ব্বাচিত

প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির পর কমিটির সভাপতি কমরেড সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তহারা সমস্যার গুরুত্ব ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা করেন এবং তারপর তিনি বাস্তহারা সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত দাবী সম্বলিত মূল চার্টার অফ ডিমাণ্ডস পেশ করেন।

১। বাস্তহারাদিগকে পশ্চিম বাংলার এবং পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোনও সুদূর প্রদেশে অথবা আন্দামানে পাঠান চলিবে না।

২। বাস্তহারাদের ষ্টেশনের প্লাট-ফরমে বা ট্রানজিট ক্যাম্পে ২ দিনের বেশী রাখা চলিবেনা। দুইদিন পর তাহাদের স্থায়ীভাবে থাকিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে পথে বা ট্রানজিট ক্যাম্পে তাহাদের আহারাদির ও অন্য সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী পুনর্বসতির ব্যবস্থা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ বাসস্থান ও খাদ্য এবং বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতি মাসে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১৫ টাকা করিয়া এবং অল্প বয়স্কদিগের জন্য মাসে ১০৲ করিয়া নগদ সাহায্য দিতে হইবে। স্থানান্তরিত করিবার সময়ে সরকারী ব্যয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য যাবতীয় জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ দায়ীত্ব সরকারকে লইতে হইবে

৪। যে সকল বাস্তহারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন তাহাদের জন্য যুদ্ধ পূর্ব্ব কালীন হারে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এবং যাঁহারা পরিত্যক্ত গৃহাদিতে বাস করিতেছেন তাঁহাদের জন্য অধিকন্তু বাসস্থানের ব্যবস্থা না করিয়া স্থানান্তরিত করা চলিবে না। কোন স্থান হইতেই বাস্তহারাদের উচ্ছেদ করা চলিবে না। বাস্তহারাদিগের জন্য সরকারী খরচায় বাসযোগ্য বাড়ীঘর করিয়া দিতে হইবে। যাহারা নিজ খরচে বাড়ী ঘর তৈয়ারী করিয়া থাকিতে চাহেন তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে হইবে।

৫। পশ্চিম বঙ্গের ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের সমস্ত আবাদ যোগ্য পতিত জমি বাস্তহারা-কৃষকদিগের মধ্যে ৫ জনের সংসারের হিসাব ১৫ বিঘা করিয়া বিলি করিতে হইবে। ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনধারণের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

৬। বাস্তহারাদিগের জন্য সরকারী ব্যয়ে পানীয় জল পায়খানা, ও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

"দিল্লী ও করাচীর দিকে চেয়ে বসে থাকলে বাস্তহারা সমস্যার সমাধান হবে না। যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে ৬০ লাখ বাঙালী ঘর বাড়ী ছেড়ে ইট কাঠ পাথরের মত আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াতে ও পশুর অধম জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে সেই ভারতীয় বা পাকিস্তানী রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করবে না, করতে পারে না। বাস্তহারা সমস্যা আজ আর প্রাদেশিক সমস্যা নয়, আজ তা ব্যাপক সর্ব্ব-ভারতীয় সমস্যা। তাই তার সমাধান প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যে খুঁজতে গেলে ভুল হবে। তাকে সমাধান করতে হবে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে, কৃষকের জমির লড়াই, শ্রমিকের রুজি রুটী ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে। আর তা করতে হলে বাস্তহারা ভাইবোনদের সংগ্রামী ঐক্য-বদ্ধতা গড়ে তুলতে হবে, নিজেদের বিপ্লবী নেতৃত্ব সংগঠিত করতে হবে, সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধতার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদকে নস্যাৎ করার প্রস্তুতি গড়ে যেতে হবে।" —গত ১২ই ও ১৩ই আগষ্ট তারিখে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা সম্মেলনের যে প্রতিনিধি অধিবেশন ইউ-নিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এবং প্রকাশ্য অধিবেশন ময়দানে হয় তাহাতে কমরেড সুবোধ ব্যানর্জী উপরোক্ত আহ্বান দেন।

এই সকল কাজে বাস্তহারা চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে উপযুক্ত মাহিনা দিয়া নিয়োগ করিতে লইবে। লোক সংখ্যা অনুপাতে ছোট কলোনীতে ছোট চিকিৎসা কেন্দ্র ও ছোট মাসপাতাল ও বড় কলোনীতে বড় চিকিৎসা কেন্দ্র ও বড় হাসপাতাল খুলিতে হইবে। এই সকল হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র-গুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক অন্যান্য কর্ম্মচারী ও উপযুক্ত পরিমান ঔষধ ও পথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

৭। সরকারী ব্যয়ে প্রতি ক্যাম্প, কলোনী ও অন্যান্য সকল বাস্তহারা ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বাস্তহারা কেন্দ্রগুলিতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্কুল ও শিল্প-কেন্দ্রে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বাস্তহারা ছাত্রদের মাইগ্রেশন ফি নেওয়া বন্ধ করিতে হইবে

৮। প্রতি ক্যাম্পে ও কলোনীতে সমবায় প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হইবার জন্য সরকারী ব্যয়ে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সেই সকল স্থানে বাস্তহারাদের নিয়োগ করিতে হইবে। বিশেষভাবে অসহায় বাস্তহারা মা-বোন দের কুটির শিল্পে নিয়োজিত করিয়া স্বাবলম্বী হইবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে

৯। বাস্তহারা কারিগরদিগকে বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ করিতে হইবে। বিভিন্ন কারখানায় ডবল শিফটে কাজ চালাইয়া নিয়োজিত করিতে এবং বেকার বাস্তহারাদিগের জন্য মা-বোন সমেত সকলকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বেকার ভাতা দিতে হইবে।

১০। সহরের নিকটবর্ত্তী বাসযোগ্য পতিত জমি সরকারকেরিকুইজিশন্ করিয়া বাস্তহারাদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিলি করিয়া দিতে হইবে। কলোনী স্থাপনের অধিকার দিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে বাড়ী তৈয়ারীর সমস্ত প্রকার মাল মশল্লা ও গৃহনির্ম্মাণ দ্রব্যাদি পাইবার সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। বাস্তহারাদের নিজ প্রচেষ্টায় স্থাপিত কলোনীগুলি হইতে তাহাদের উচ্ছেদ করা চলিবে না। এইগুলিকে আদর্শ পল্লী হিসাবে গড়িয়া তুলিতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে হইবে।

১১। বাস্তহারাদিগের উপর সকল অত্যাচারী ও হত্যাকারীদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে হইবে। বাস্তহারাদিগের বিরুদ্ধে সকল মামলা বিনাসর্ত্তে প্রত্যাহার করিতে হইবে। বাস্তহারাদের দাবীর আন্দোলনে বা তাহার সমর্থনে ধৃত সমস্ত কর্ম্মীদিগকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিতে হইবে। শহীদদিগের পরিবারে ক্ষতিপূরন সহ উপযুক্ত ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাস্তহারা ক্যাম্প কলোনী হইতে ১৪৪ ধারা উঠাইয়া লইতে হইবে ও পুলিশ পিকেট প্রত্যাহার করিতে হইবে। সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিবার পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।

১২। নূতন বাস্তহারা যখনই আসিবে তখনই তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার ও সকল প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে।

১৩। বাস্তহারা ব্যবসায়ী, হকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবি ইত্যাদি সকলপ্রকার পেশার বাস্তহারাদিগের জন্য উপযুক্ত পরিমানে এককালীন অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। বাস্তহারা জেলেদের জন্য অন্যান্য কারিগরী লোকদের মত জাল নৌকা সরবরাহ করিতে হইবে এবং জলের উপর মাছ ধরিবার অধিকার দিতে হইবে

(ক্রমশঃ)

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উদ্দেশ্য এর বুঝতে কারও কোন কষ্ট হয় না। আবার একটা তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাবার যে ষড়যন্ত্র ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবির করে চলেছে তার বিভিন্ন পরিকল্পনা হল এই সব ব্যবস্থা। সোভিয়েট ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে পশ্চিমদিক থেকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রচিত হল অতলান্তিক চুক্তি দক্ষিণ দিকে গড়ে তোলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ঘাঁটীর শৃঙ্খল। ভূমধ্যসাগরীয় ব্লক গড়ার কথা বার্ত্তা চলবে ট্রাস্‌বুর্গে আর পূর্ব্ব দিকে জাপানকে ত বারুদের কারখানায় পরিণত করা হয়েছে।

আর একটা বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিজয়ের যে স্বপ্ন মার্কিন দেখছে তার জন্যই এই সব চক্রান্ত। কিন্তু শান্তি শিবির তাদের সেই ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আবেদন

মালদহ জিলার পার্টি সংগঠক, কমরেড রবীন দেব, এস, ইউ, সির প্রতিটি জিলা ও ইউনিট এবং গণদাবীর সহৃদয় পাঠকদিগের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি উহা যথোপযুক্ত সাড়া পাইবে। আবেদনটি নিম্নোক্তরূপ :—

"এস, ইউ, সির বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সুবোধ দাস আজ ২৫ দিন দুরন্ত টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী। ইদানাং তাঁহার অবস্থা আদৌ ভাল নয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব হইলে তাঁহার বাঁচার সম্ভাবনাই কম। অথচ অর্থের অভাবে সুচিকিৎসা হইতেছে না। এই অবস্থায় প্রতিটি জিলা ও ইউনিট এবং গণদাবীর সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া কমরেড দাসের জীবন রক্ষার কাজে আগাইয়া আসুন।"

রবীন দেব
C/o এম. এন, দেব
হায়দারপুর
মালদা, পশ্চিম বাংলা

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম-তলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত